স্মৃতিচারণ

ইমাম সাহেব কাহাহে?

মাওলানা আবদুল হক

১৯৭১ সাল! ২৫ মার্চ শেষ রাতে এবং ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নিরস্ত্র ঘুমন্ত বাঙালির ওপর ঢাকায় প্রথম আঘাত করে। তারপর চট্টগ্রাম রাজশাহী সহ বাংলাদেশের অন্যান্য সেনানিবাসে আঘাত করে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী সহ দেশের অন্যান্য সেনানিবাসের সদস্যরা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফলে তারা সেনা ক্যাম্প/ সেনা চাউনি থেকে বের হয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়ে সংঘটিত হতে থাকে। এমনি একটি কাফেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত আশুগঞ্জ উপজেলার যাত্রাপুর লাইন পাড় কেবিন মসজিদের পাশে আশ্রয় নেয়।

একজন ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে ছয় জন ই.পি.আর এর সদস্য এবং কয়েকজন সেনা সদস্য মিলে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যে মসজিদের চারদিকে ব্যাংকার/ঘাঁটি তৈরি করে। রাতে তারা ইমাম ও মোয়াজ্জিনের বিশ্রামের স্থানে মিনারায় অথবা মসজিদের বারান্দায় বিশ্রাম নেয়।

আশে-পাশের বাড়িঘর হতে তাদের খাবারের জন্যে চাল, ডাল, ডিম টাকা পয়সা ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছিল। রান্না-বান্না করে খাবার প্রস্তুত করার দায়িত্ব আমার স্ত্রীর উপর ছিল। তাছাড়া ঢাকার বিভিন্ন স্থান হতে যে, সব স্মরণার্থী রেল লাইন ধরে হেঁটে আসত তাদের পানি ও হাল্কা নাস্তা (একটি রুটি ও একটু ডাল) ইত্যাদি তৈরি করার দায়িত্বও তার উপর ছিল। অবশ্য এতে তার কোন বিরক্তি বোধ ছিল না। বরং কাউকে কিছু একটা খেতে দিতে পারলেই সে যেন আনন্দ বোধ করত।

এদিকে সেনা সদস্যরা হাল্কা মেশিনগাণ এল.এম.জি. রাইফেল ইত্যাদি নিয়ে মহড়া করে/ পিটি করে। এসব ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত চলে। পনের এপ্রিল বিকাল ৪ঘটিকায় হঠাৎ করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিমান আশুগঞ্জের আকাশে উড়ে এল। আশুগঞ্জ খাদ্য গুদাম সাইলোতে কয়েকটি বোমা ফেলে আবার ঢাকায় ফিরে গেল। এ যেন তাদের অনটেস্ট মহড়া। সেনা সদস্যরা খুব সতর্কতার সাথে মসজিদের ছাদ থেকে মেশিনগানের গুলি ছোঁড়ে। আমি আসর ও মাগরিবের নামায এর ইমামতি করি। মাগরিবের নামাযের শেষে পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তায় একটু চিন্তিত হই। অবশেষে পরিবারকে আমি রেল লাইনের পাশে মসজিদ থেকে একটু দূরে বৈকণ্ঠপুর গ্রামে আমার এক ভক্ত মরহুম জিন্নাত আলী মিয়ার বাড়িতে রেখে এশার নামাযের জন্যে মসজিদে আসি। নামাযান্তে রাতে বিশ্রামের জন্যে আবার মরহুম জিন্নাত আলী মিয়ার বাড়িতে ফিরে যাই।

১৬ এপ্রিল ১৯৭১ সাল। বাংলা তারিখ শুরু হওয়ার সাথে সাথে আশুগঞ্জ'র আকাশে পাকিস্তানী জেট বিমানগুলো উড়ে এল। মনে হলো উদিত সূর্য তার কিরণে যে আভা ছড়ায় তারই অংশ হিসেবে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর যুদ্ধ বিমানগুলো আশুগঞ্জ আকাশে ছোটাছুটি করছিল। শুরু হলো চারদিকে অনবরত গুলি বর্ষণ। প্রাণভয়ে জ্ঞানহারা মানুষগুলো যে যার মত করে গ্রামের দিকে ছুটে চলছিল। সকাল দশটার দিকে পাকিস্তানী হেলিকপ্টার থেকে পদাতিক বাহিনীর সদস্যরা আশুগঞ্জ ওয়াপদার পূর্ব পাশে নামতে শুরু করল। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনী/ সেনাবাহিনীর সদস্যরা পিছু হটতে শুরু করল। যে যার মত করে এদিক ওদিক চলে যেতে লাগল। পাকিস্তানী বাহিনী দখল করে নিল আশুগঞ্জ ভূখণ্ড। তারপর চালাল নির্মম অত্যাচার। ওয়াপদার আশপাশের বাড়িঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিল। যেখানে যাকে পেল ধরে নিয়ে গেল অথবা গুলি করে হত্যা করল। আমি উপায়ন্তর না দেখে পরিবার পরিজন সহ আমার শ্বশুরালয় আড়াইসিধা গ্রামে উঠলাম। যুদ্ধ চলল দীর্ঘ নয় মাস। যুদ্ধের অধিকাংশ সময় ঐ গ্রামে ছিলাম। আড়াইসিধা গ্রাম হতে যাত্রাপুর লাইনপাড় কেবিন মসজিদের দূরত্ব মাত্র তিন থেকে চার কিলোমিটার পায়ে হাঁটার পথ। তথাপি যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কোন দিন ইমামতি এর জন্যে কেবিন মসজিদে আসতে পারিনি। কারণ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সদস্যরা যখনই মসজিদে আসত তখনই মসজিদের চারদিকে মুক্তি বাহিনীর ব্যাংকার দেখে প্রশ্ন করত মসজিদের চারদিকে ব্যাংকার কেন? "ইমাম সাহেব কেয়ছা আদমী হ্যাঁয়"! "ইমাম ছাহেব কাহাহে?" "উছকো পাকড়াও আওর এদারছে লে আউ।" স্বাধীনতার ৪৩ বৎসর পরেও স্মৃতিতে ভেসে উঠা দিন গুলোর কথা মনে হলে কেঁপে উঠি। স্মৃতির ইতিহাস আজ উত্তরসুরিদের জন্যে রাখলাম।